বাংলাদেশে নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে বিএসএফ?

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, ঢাকা

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানার বিডিআর সদর দফতরে বিদ্রোহে শতাধিক সেনাকর্মকর্তার পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে বিপুল ক্ষতি হয়ে গেছে বাংলাদেশের। এ ঘটনা পৈশাচিক, বর্বরোচিত ও নিষ্ঠুর। সাধারণ মানুষের কাছে এটা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। বাংলাদেশের শতাধিক সেনাকর্মকর্তাকে এভাবে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রেও একসাথে হত্যা করা সম্ভব ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডে গোটা জাতি স্তম্ভিত, হতবিহ্বল এবং শোকাভিভূত। এই হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের সরকার, জনগণ, সেনাবাহিনী কিংবা বিডিআর কেউ লাভবান হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবাই। এই হত্যাকাণ্ডে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে নিয়োজিত যে শতাধিক চৌকস সেনাকর্মকর্তাকে আমরা হারিয়েছি, তাদের পুনর্বাসনের জন্য ২০ থেকে ২৫ বছর সময় লাগবে বলে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ রাইফেলসকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সময় লাগবে ২০ থেকে ৩০ বছর। ২৫ ফেব্রুয়ারির সকালে পিলখানায় কী ঘটেছিল তার পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখনো আমাদের কাছে নেই। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে বিডিআর'র দরবার হলে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, সেনাকর্মকর্তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা হয়েছিল, যাতে বেছে বেছে তাদের হত্যা করা সম্ভব হয়। এক দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় দেশের এক-তৃতীয়াংশ কমান্ডিং অফিসার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো রণক্ষেত্রেও ঘটানো সম্ভব হয়নি।

কিন্তু বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা সে কাজটি সুচারুভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছে। এর সাথে বিডিআর'র একশ্রেণীর রাষ্ট্রদ্রোহী জড়িত যে ছিল না তা নয়। কিন্তু এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করার জন্য তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল বাইরের ভাড়াটে খুনিরাও। একজন সেনাকর্মকর্তা জানিয়েছেন, গোলাগুলি শুরু হওয়ার পরপরই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিডিআর'র দরবার হলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একটি ছাই রঙের পিকআপ ভ্যান। বিডিআর'র পোশাক পরিহিত সেই লোকেরাও অংশ নিয়েছিল এই কিলিং মিশনে। মুখে লাল কাপড় বেঁধে তারা নির্দেশ দিচ্ছিল কাকে কাকে খুন করতে হবে। তদন্ত যদি সুষ্ঠু হয়, তদন্তের লক্ষ্য যদি জাতির সুরক্ষা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এক সময় এসব রহস্য উন্মোচিত হবে। জনগণ প্রকৃত সত্য জানতে পারবে।

আমরা আগেই বলেছি, এই হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের কারো লাভ হয়নি। তাহলে এই ষড়যন্ত্রমূলক হত্যাকাণ্ডে লাভ হলো কার? তাদেরই লাভ হলো যারা বাংলাদেশকে দেখতে চায় একটি অকার্যকর, দুর্বল, ভঙ্গুর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে। ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি বাংলাদেশে যে অসাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার পেছনেও ছিল বাংলাদেশবিরোধী এক বিশাল চক্রান্ত। আমরা তখনো বারবার সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম সেনাসমর্থিত ওই সরকার যেন এমন কাজ না করে যাতে জনগণ সেনাবাহিনীকে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে মনে করতে শুরু না করে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেই সরকার সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীরা সেনাবাহিনীকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বিডিআর-বিদ্রোহীরা সেই সুযোগটুকু প্রথম দিকের কয়েক ঘণ্টা ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছিল। তারা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এমন সব বক্তব্য দিতে শুরু করেছিল যে, মিডিয়া একতরফাভাবে সেগুলো প্রচারও করে যাচ্ছে। তখন অবশ্য অপর পক্ষের ভাষ্য নেয়ার মতো কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে হত্যাকারীরা কিছুটা সময় সব কিছুই অন্ধকারে রাখতে পেরেছিল। তখন মিডিয়ার লোকেরা বুঝে উঠতে পারেননি যে, এই ধন্দের আড়ালে ষড়যন্ত্রকারীরা দেশের কী বিরাট সর্বনাশ করে যাচ্ছে। এ দিকে আবার নিপুণ খেলার অংশ হিসেবে ভিন্ন আয়োজনও করা হয়েছিল। এক দিকে সমরবিদ্রোহের রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা, অপর দিকে পরিকল্পিতভাবে বিডিআর'র সমর্থনে মিছিলের আয়োজন। সব কিছুই ছিল এই পরিকল্পনার অংশ। বিডিআর'র সমর্থনে আয়োজিত মিছিলের ছদ্মাবরণে ঘাতকরা মিশে যাচ্ছিল সেই মিছিলের মধ্যে। এভাবেই পালিয়েছে প্রকৃত অপরাধীরা মিছিলের ওপর ভর করে।

আমরা লাভক্ষতির কথা বলছিলাম। সেনাকর্মকর্তাদের ওপর পরিচালিত এই গণহত্যায় নিঃসন্দেহে দুর্বল হয়েছে সেনাবাহিনী ও বিডিআর। বিডিআর বাংলাদেশ সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী। তাদের বীরত্ব ও

সাহসিকতা সর্বজনবিদিত। সীমান্ত সুরক্ষাসহ চোরাচালান রোধ, মাদক পাচার রোধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তারা নিয়োজিত। ভারত বরাবরই চেয়েছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে দুর্বল করে দিতে। এ ক্ষেত্রে তাদেরই লাভ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। প্রাথমিকভাবে ভারতের প্রতিক্রিয়াও প্রণিধানযোগ্য। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ভারত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে বাংলাদেশকে যেকোনো ধরনের সহায়তা করার প্রস্তাব দেয়। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি প্রস্তাব দেন যে, আর্থিক বৈষম্যের কারণে বিডিআর যদি এই বিদ্রোহ করে থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য দিতে পারে ভারত। যেন বাংলাদেশ পাঁচ-দশ কোটি টাকার অর্থের সঙ্কটে পড়েছে যার জন্য বাংলাদেশকে ভারতের কাছে হাত পাততে হবে! ভারতের এই তাচ্ছিল্য আমাদের মনে রাখার দরকার আছে।

ভারতের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আরো সাংঘাতিক। সে ক্ষেত্রে তাদের মতলবের আর কোনো রাখঢাক নেই। তারা বলেছে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভারত বাংলাদেশে তাদের আধা সামরিক বাহিনী, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ, রেলওয়ে নিরাপত্তা পুলিশ, এমনকি বাংলাদেশ চাইলে ভারতের বিএসএফকে (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) বাংলাদেশে পাঠাতে পারে। ওই প্রস্তাবে চমৎকারিত্ব আছে।

বিডিআর-বিদ্রোহের পর স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ রাইফেলস সঙ্কটে পড়েছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে তাদের অস্ত্রসমর্পণের নির্দেশ দেয়া হয়। ফলে সীমান্তের কোথাও কোথাও এক ধরনের শূন্যতা তো সৃষ্টি হবেই। বিডিআর বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। বিএসএফ ভারতের সীমান্ত রক্ষার কাজ করে। এখন ভারতের প্রস্তাব হলো ভারতের সীমান্তও রক্ষা করবে বিএসএফ, বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বেও থাকবে বিএসএফ। কী অসাধারণ প্রস্তাব! অর্থাৎ প্রয়োজন নেই বিডিআর বাহিনীর, প্রয়োজন নেই সম্ভবত সীমান্তেরও ভারত-বাংলাদেশ একাকার। প্রস্তাবটা বেশ সরলভাবে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, সীমান্তেও এখন আর বিডিআর নেই, তাহলে ঢাকা-কলকাতার মধ্যে চলাচলকারী মৈত্রী ট্রেনের নিরাপত্তা কী? ট্রেন, ট্রেনের ইঞ্জিন পরিবাহিত পণ্য ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ভারতীয় বিএসএফ ঢাকা-কলকাতার মৈত্রী ট্রেনের নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করবে। এই মৈত্রী ট্রেনেও এক আজিব তামাসা। গত বছর পয়লা বৈশাখ খুব তড়িঘড়ি করে চালু করা হয় এই ট্রেন। প্রথম প্রথম বেশ উৎসাহ ছিল কলকাতাগামী যাত্রীদের। ভারতীয় ইমিগ্রেশনের দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ ও অসহযোগিতার কারণে সে উৎসাহে এখন ব্যাপক ভাঁটা পড়েছে। বিশাল এই লটবহরের ট্রেনে করে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন যাতায়াত করে ১০-১২ জন যাত্রী। ভারতীয়রা আসেও কম। যায় চিকিৎসার্থী বাংলাদেশী যাত্রীরা। চিকিৎসা থেকে ফেরেও তারাই। সেই মৈত্রী ট্রেনের নিরাপত্তার জন্য ভারতের কী যে আকুতি, যার জন্য ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে বাংলাদেশে অবাধে চলতে দিতে হবে।

এর আগে ভারত তামিল বিদ্রোহ দমনের জন্য শ্রীলঙ্কায় এমনি এক শান্তি মিশন পাঠিয়েছিল। আসলে ওই বিদ্রোহীদের সৃষ্টি করেছিল ভারত, মদদ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে ভারত; আবার সেই বিদ্রোহীদের দমনের জন্য বন্ধু সেজে শান্তি মিশনও পাঠিয়েছিল ভারত। তামিল বিদ্রোহ তখন দমন তো হয়ই নি, বরং ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী শ্রীলঙ্কান সৈনিকের রাইফেলের বাঁটের আঘাতে কুপোকাত হয়েছিলেন। এখন যখন শ্রীলঙ্কা নিজেই তামিল বিদ্রোহীদের ঘাঁটিগুলো প্রায় ধ্বংস করে এনেছে, তখন ভারত শ্রীলঙ্কার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে, শ্রীলঙ্কা যেন তাদের নির্মূল না করে বরং যুদ্ধবিরতি করে। অর্থাৎ এই বিদ্রোহীরা থাক, পরে কোনো সময় ভারত যেন তাদের ব্যবহার করতে পারে। যেখানে শতাধিক চৌকস সেনাকর্মকর্তার হত্যাকাণ্ডে গোটা জাতি মুহ্যমান, সেখানে ১০-১২ জন ট্রেনযাত্রীর নিরাপত্তার নামে বাংলাদেশে বিএসএফ পাঠানোর প্রস্তাব বন্ধুত্বের চরম স্মারক বৈকি! এ দিকে ২৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআর-বিদ্রোহের আগের দিন হঠাৎ করেই বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ নিরাপত্তা জোরদার করে তোলে। আমদানি-রফতানিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তবে কি ভারত আগে থেকেই জানত যে, পরদিন বাংলাদেশে বিডিআর-বিদ্রোহীদের ঘটনা ঘটবে এবং বিদ্রোহের দিনই বাংলাদেশে বিএসএফ পাঠানোর প্রস্তাব কী অর্থ বহন করে? বিডিআর তো শেষ করে দেয়া হয়েছে, এবার আমাদের বিএসএফকে নাও। অর্থাৎ উন্মুক্ত রাখো বাংলাদেশের সীমান্ত। আর প্রায় তখনি সীমান্তের অনেক স্থানেই বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী

বিএসএফ। আর এর মধ্যেও পাখি শিকারের মতো সীমান্তে বাংলাদেশের নিরীহ নাগরিকদের প্রতিদিন রুটিন-মাফিক হত্যা করেই যাচ্ছে বিএসএফ। সেই বিএসএফকে দাওয়াত দিয়ে ঘরে নিয়ে আসবো? ভারত সরকারের এসব কুমতলবের সাথে সেখানকার মিডিয়া বরাবরের মতোই সুর মিলিয়ে নানা ধরনের। অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিডিআর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তারা ভারতের সাথে ছিল খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবসম্পন্ন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিডিআরে যারা নতুন ঢুকেছে, তারা ভারতের প্রতি বিরূপ। ফলে সীমান্তে কখনো কখনো সজ্ঞাত বেঁধে যায়। এই নতুনরা প্রায় সবই জামায়াত সমর্থক কট্টরপন্থী। আর একই কট্টরপন্থীদের মদদ দিচ্ছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই কী অদ্ভুত গোঁজামিল।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা সীমান্তরক্ষী বাহিনী দুর্বল হলে ভারতের লাভ বাংলাদেশের ওপর তাদের যে খবরদারি মনোভাব, তার বাস্তবায়ন সহজ হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দুর্বল থাকুক সে চেষ্টা ভারত দীর্ঘকাল ধরেই করে আসছে। পাকিস্তান যদি ভারতকে শত্রুই মনে করে তাহলে তারা চাইবে যে, ভারতের সীমান্তে শক্তিশালী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তাকে দুর্বল করলে শত্রুকেই সহযোগিতা করা হবে।

ভারতীয় প্রচারমাধ্যম আরো বলছে, এই বিদ্রোহের পেছনে হাত রয়েছে জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবির। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন জানে, শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগারদের মতো বাংলাদেশের জেএমবি ভারতেরই সৃষ্ট একটি সংগঠন। এর মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস পায়। ইতঃপূর্বে দেখা গেছে, জেএমবি'র দখলে যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ পাওয়া গেছে তার সবই ভারতীয় সমরাস্ত্র কারখানায় তৈরি। জেএমবি'র একেকজন নেতা বছরে ১০-১৫ বার করে পরামর্শের জন্য ভারত সফর করেছে। বিএনপি'র শাসনকালে জেএমবি'র তৎপরতা কঠোর হাতে দমন করা হয়েছিল। এখন নতুন করে তাদের মদদ দেয়া শুরু হয়েছে। সুতরাং জেএমবি যদি বিদ্রোহের পথে জড়িত থাকে, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এই চক্রান্তের পেছনে ভারতীয়দের হাত আছে।

তাই আমরাও মনে করি, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের আসল ঘটনা উদ্ধার করা হোক। প্রকৃত সত্য দেশবাসীকে জানানো হোক। বিডিআর-বিদ্রোহের মাধ্যমে বাংলাদেশের শতাধিক সেনাকর্মকর্তার হত্যাকাণ্ডে আমরা এক বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে পড়েছি। এই বিপর্যয় উত্তরণের একমাত্র পথ ইস্পাতদৃঢ় জাতীয় ঐক্য। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন বরাবর বালখিল্যতায় রত। কিন্তু জনগণের সুদৃঢ় ঐক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে সব ষড়যন্ত্র পরাভূত হবেই।

লেখক ঃ সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কলামিস্ট